একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

Multidimensional expression of female psychology in Tapan Banerjee's selected short stories

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটোগল্পে নারী মনস্তত্ত্বের বহুমাত্রিক প্রকাশ

Name of the Author: PRADYUT SHIL

Affiliation: Research Scholar (Ph.D.), Swami Vivekananda Research Centre, Ramakrishna Mission Vidyamandira Belur Math, Howrah, West Bengal-711202

Abstract: The short stories of Tapan Bandyopadhyay present a profound exploration of human psychology within the framework of social reality. Among the most significant aspects of his narratives is the nuanced portrayal of women's psychology. His stories depict women not merely as supporting characters but as complex individuals whose emotions, struggles, and inner conflicts shape the narrative. Through stories such as Sap, Byabhicharini, Kukur, Lashkata Ghar, Samudrer Chokh, Nisarger Chokh, Bhason, Loy, and Brahmar Hate Gora Putul, the author portrays diverse dimensions of female consciousness.

These narratives reveal various psychological aspects of women, including fear, maternal instinct, emotional vulnerability, loneliness, social humiliation, desire for love, creative aspirations, and the struggle for dignity. Characters like Shankhalekha, Pallabi, Pitha, Shrelekha, Papiya, Mou, and Ekadashi represent different social backgrounds and emotional realities, reflecting how women respond to social pressure, poverty, betrayal, and personal aspirations.

Bandyopadhyay's portrayal highlights that women's psychological experiences are deeply connected with social structures, family expectations, and cultural norms. His stories illustrate how women endure suffering, negotiate relationships, and seek identity within restrictive circumstances. Thus, the multidimensional representation of female psychology in his short stories enriches Bengali literature by revealing the emotional depth, resilience, and humanity of women's lives.

Keywords Tapan Bandyopadhyay, Bengali Short Stories, Women's Psychology, Social Reality, Feminine Identity, Maternal Instinct, Emotional Conflict, Social Oppression, Loneliness and Alienation, Human Relationships

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটোগল্পে নারী মনস্তত্ত্বের বহুমাত্রিক প্রকাশ

প্রদ্যোত শীল

বাংলা ছোটোগল্পে সামাজিক বাস্তবতার পাশাপাশি মানুষের অন্তর্জগতের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষত নারীর মনস্তত্ত্ব—তার অনুভূতি, অপমান, আকাঙ্ক্ষা, ভয়, লজ্জা, প্রতিবাদ এবং বেঁচে থাকার সংগ্রাম—আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নতুন মাত্রা পেয়েছে। এই ধারার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গল্পকার হলেন তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর গল্পগুলিতে সমাজের বাস্তব সমস্যার পাশাপাশি নারীর অন্তর্জগত অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও মানবিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষিত হয়েছে। তাঁর গল্পে প্রকৃতি, সমাজ, দারিদ্র্য, সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং মানুষের মানসিক প্রতিক্রিয়া গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়। বিশেষ করে তাঁর অনেক গল্পে নারীচরিত্রের উপস্থিতি শুধু ঘটনাপ্রবাহের অংশ নয়, বরং মানবমনের জটিল স্তরগুলির এক শক্তিশালী প্রকাশ।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে নারীচরিত্র কখনও গৃহবধূ, কখনও শিল্পী, কখনও প্রেমিকা, কখনও মা—আবার কখনও সমাজের নিপীড়নের শিকার। তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা, আবেগ, দুঃখ, প্রতিবাদ, ভালোবাসা এবং আত্মসম্মানবোধের মাধ্যমে লেখক নারীর মনস্তত্ত্বকে বহুমাত্রিকভাবে তুলে ধরেছেন।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের “সাপ”, “ব্যভিচারিণী”, “সৈকতের মুখোমুখি সৈকত”, “লাশকাটা ঘর”, “সমুদ্রের চোখ”, “কুকুর”, “ভাসান”, “লয়”, “নিসর্গের চোখ”, “একটু একটু করে কবি হয়ে ওঠা” এবং “ব্রহ্মার হাতে গড়া পুতুল”—এই গল্পগুলিতে নারীচরিত্রের মনোজগত বিভিন্ন সামাজিক ও মানসিক প্রেক্ষাপটে প্রকাশিত হয়েছে।

এই প্রবন্ধে উল্লিখিত গল্পগুলির আলোকে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে নারী মনস্তত্ত্বের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য এবং তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হবে।

‘সাপ’ গল্পে মূল ঘটনা একটি সাপকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও এর ভেতরে মানুষের মানসিক প্রতিক্রিয়া ও পারিবারিক সম্পর্কের সূক্ষ্ম দিকগুলোও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে শঙ্খলেখা চরিত্রের মাধ্যমে লেখক নারী মনস্তত্ত্বকে অত্যন্ত বাস্তব ও স্বাভাবিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। একজন স্ত্রী, একজন মা এবং একজন গৃহিণী হিসেবে তার মানসিকতা, ভয়, উদ্বেগ, দায়িত্ববোধ এবং পারিবারিক নিরাপত্তা রক্ষার প্রবল আকাঙ্ক্ষা গল্পে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

‘সাপ’ গল্পটি মূলত এক মধ্যবিত্ত শহরতলির পরিবারের দৈনন্দিন জীবনে হঠাৎ নেমে আসা আতঙ্ক, নিরাপত্তাহীনতা ও মানুষের অন্তর্গত পশুত্বের রূপক আখ্যান। প্রসিত, তার স্ত্রী শঙ্খলেখা এবং তাদের সাত বছরের মেয়ে ডিঙ্কি—এই ছোট্ট পরিবারের শান্ত ছুটির দিনের দুপুর আচমকা ভেঙে পড়ে বাড়ির রান্নাঘরে একটি সাপ ঢুকে পড়ার ঘটনায়। কাজের মেয়ে রে ণু প্রথম সাপটি দেখতে পায়, আর সেই মুহূর্ত থেকেই পুরো বাড়ি আতঙ্কের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

সাপটি গ্যাস সিলিন্ডারের পাশ দিয়ে রান্নাঘরের নর্দমা দিয়ে বেরিয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে গ্যারাজের আবর্জনার ভেতরে আশ্রয় নেয়। এই গ্যারাজটি দীর্ঘদিন ধরে অযত্নে পড়ে থাকা, বাতিল জিনিসে ভর্তি এক অন্ধকার জায়গা—যা কেবল সাপের আশ্রয় নয়, প্রসিতের দায়িত্বহীনতা ও অবহেলার প্রতীক হিসেবেও কাজ করে। সাপের উপস্থিতি বাড়ির প্রতিটি সদস্যকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। শঙ্খলেখা ও ডিঙ্কি আতঙ্কে সিঁটিয়ে থাকে, আর প্রসিতের মনে জেগে ওঠে তার কৈশোরের ভয়াবহ স্মৃতি—পরপর দুই আত্মীয়ের সর্পাঘাতে মৃত্যুর ঘটনা।

গল্পে সাপ দেখা মাত্রই শঙ্খলেখা তীব্র আতঙ্কে ভেঙে পড়ে। এটি শুধু একটি সাধারণ ভয় নয়, বরং পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগের প্রকাশ। একজন নারী হিসেবে সে ঘরকে নিরাপদ আশ্রয় বলে মনে করে। কিন্তু সেই ঘরের মধ্যেই যখন সাপ ঢুকে পড়ে, তখন তার মনে ভয় এবং অনিশ্চয়তার অনুভূতি আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

বিশেষ করে যখন প্রতিবেশীরা সাপটিকে গোখরো বা কেউটে হতে পারে বলে সন্দেহ প্রকাশ করে, তখন শঙ্খলেখার ভয় চরমে পৌঁছে যায়। তার মনে হয়, এই সাপ যেকোনো সময় তার বা পরিবারের কারও প্রাণনাশ করতে পারে। এই ভয় নারীর স্বাভাবিক সুরক্ষাবোধেরই প্রতিফলন।

নারী মনস্তত্ত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মাতৃত্ববোধ। গল্পে শঙ্খলেখার আচরণে এই দিকটি বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যখন সে সাপের কথা মনে করে, তখন তার প্রথম চিন্তা হয় তার ছোট মেয়ে ডিঙ্কিকে নিয়ে।

সে তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে মেয়েকে খাটে তুলে বসায় এবং তাকে নিরাপদ রাখার চেষ্টা করে। ডিঙ্কিকে কোলে জড়িয়ে ধরে বসে থাকা তার ভয়ার্ত অবস্থা মাতৃত্বের গভীর উদ্বেগকে প্রকাশ করে। নিজের ভয়কে সে সহ্য করতে পারে, কিন্তু সন্তানের সম্ভাব্য বিপদ তাকে আরও বেশি বিচলিত করে তোলে।

শঙ্খলেখা একজন গৃহিণী হিসেবে সংসারের নানা দায়িত্ব পালন করে। গল্পে দেখা যায়, ঘরদোর পরিষ্কার রাখা, রান্নাঘর গুছিয়ে রাখা ইত্যাদি কাজ মূলত তারই দায়িত্ব। সে প্রায়ই প্রসিতকে অভিযোগ করে যে, প্রসিত ঘরের কাজে সাহায্য করে না এবং সব দায়িত্ব তার ওপরই পড়ে।

এই বিষয়টি নারী মনস্তত্ত্বের একটি বাস্তব দিক তুলে ধরে। পরিবারকে সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ রাখার দায়িত্ব নারীরা অনেক সময় একাই বহন করে। গ্যারাজে জমে থাকা আবর্জনা বা অযত্নের কারণে সাপ ঢোকার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে—এই বিষয়টি পরোক্ষভাবে শঙ্খলেখার অভিযোগকে সত্য প্রমাণ করে।

গল্পে দেখা যায়, শঙ্খলেখা অনেক সময় প্রসিতের চেয়ে বেশি বাস্তববাদী ও সতর্ক। যখন প্রসিত সাপ মারার চেষ্টা করতে চায়, তখন শঙ্খলেখা তাকে থামিয়ে দেয়। সে বুঝতে পারে, এই কাজ অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং প্রসিতের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

এখানে নারী চরিত্রের বিচক্ষণতা ও বাস্তব বিচারক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে। সে অকারণে ঝুঁকি নিতে চায় না। বরং নিরাপদ উপায় খোঁজার চেষ্টা করে—কার্বলিক অ্যাসিড আনার কথা বললে সাবধানে থাকার পরামর্শ দিয়েছে।

গল্পে প্রতিবেশীরা প্রথমে অনেক কথা বললেও প্রকৃত বিপদের সময় কেউ এগিয়ে আসে না। এই বিষয়টি শঙ্খলেখাকে খুবই হতাশ ও ক্ষুব্ধ করে। সে প্রসিতকে বলে— "দেখলে পাড়ার লোকের কাণ্ডটা! কেউ একবার চেষ্টা করল না সাপটাকে মারার।"

এই বক্তব্যে নারী মনস্তত্ত্বের আরেকটি দিক প্রকাশ পায়—সমাজের প্রতি প্রত্যাশা ও সেই প্রত্যাশা ভঙ্গ হলে হতাশা। একজন গৃহিণী হিসেবে সে মনে করে, প্রতিবেশীরা বিপদের সময় সাহায্য করবে। কিন্তু বাস্তবে তা না হওয়ায় তার মধ্যে ক্ষোভ জন্মায়।

সাপের উপস্থিতি শঙ্খলেখার মানসিক অবস্থাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সে রাতভর আলো জ্বালিয়ে রাখে, জানালা-নালা বন্ধ করে দেয় এবং মেঝেতে পা ফেলতেও ভয় পায়। এই আচরণগুলো আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। নারী মনস্তত্ত্বে অনেক সময় ভয় ও উদ্বেগ দ্রুত এবং তীব্রভাবে প্রকাশ পায়। গল্পে শঙ্খলেখার আচরণ সেই বাস্তব মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ারই প্রতিফলন।

গল্পের শেষদিকে যখন জানা যায় যে সাপটি তাদের বাড়ি ছেড়ে শতদ্রু রায়ের বাড়িতে ঢুকেছে, তখন শঙ্খলেখার মুখে স্বস্তির ছাপ ফুটে ওঠে। সে প্রসিতকে ওদিকে যেতে বারণ করে এবং বলে—"যা করার ওরাই করুক।"

এখানে এক ধরনের মানসিক প্রতিশোধ বা স্বস্তির আনন্দ প্রকাশ পায়। যারা আগে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি, এখন তাদেরই বিপদে পড়তে দেখে শঙ্খলেখা এক ধরনের নীরব তৃপ্তি অনুভব করে। এটি মানুষের স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া।

'সাপ' গল্পে শঙ্খলেখা চরিত্রের মাধ্যমে নারী মনস্তত্ত্বের নানা দিক অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ভয়, মাতৃত্ববোধ, দায়িত্বশীলতা, বাস্তববোধ, সামাজিক প্রত্যাশা ও মানসিক প্রতিক্রিয়া—সব মিলিয়ে শঙ্খলেখা এক জীবন্ত ও বাস্তব চরিত্র হয়ে উঠেছে। এই গল্পে নারী চরিত্রকে দুর্বল হিসেবে নয়, বরং পরিবারকে রক্ষা করতে সচেতন ও দায়িত্ববান এক মানসিক শক্তির প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে।

'ভাসান' গল্পটি একটি গ্রামীণ জনপদের ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কাহিনি, যেখানে নদী, বৃষ্টি, ঝড় ও বন্যা মানুষের জীবনের উপর নির্দয়ভাবে আছড়ে পড়ে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সাত-আট বছরের শিশু বিতুন। তার শিশুমনের ভয়, কৌতূহল, মানবিক বোধ এবং শেষ পর্যন্ত নির্মম বাস্তবের মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে লেখক বন্যার ভয়াবহতা ও সামাজিক বৈষম্যকে গভীরভাবে তুলে ধরেছেন।

টানা তিন দিনের প্রবল বর্ষণের ফলে ফুলেশ্বরী নদীর জল বিপজ্জনকভাবে বাড়তে থাকে। গ্রামের অধিকাংশ কাঁচা বাড়ি জলমগ্ন হলেও বিতুনদের পাকাবাড়ি কিছুটা উঁচু হওয়ায় প্রথমে টিকে যায়। কিন্তু রাতভর

ঝড়, বজ্রপাত ও ঘূর্ণির তাণ্ডবে পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। বাড়ির ভিতর জল ঢুকে পড়ে, পরিবারটি তক্তপোশে আশ্রয় নেয়। চারপাশে আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা আর মৃত্যুভয়।

এই সময়েই প্রকাশ পায় সামাজিক বাস্তবতা। বিতুনদের পরিবার তুলনামূলক সচ্ছল—বাবা প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। অন্যদিকে বিজুদের পরিবার চরম দরিদ্র; তাদের কাঁচা চালাঘর ঝড়ে ধসে পড়ে। অথচ সামাজিক দূরত্বের কারণে বিজুদের পরিবার আশ্রয় চাইতেও পারে না। তারা বাধ্য হয়ে নদীবাঁধে রাত কাটায়। এই বৈষম্য গল্পে নীরবে কিন্তু তীব্রভাবে উপস্থিত।

বন্যার জল বাড়তে বাড়তে একসময় নামতে শুরু করে। প্রাণে বেঁচে যাওয়ার স্বস্তির সঙ্গে সঙ্গে বিতুনদের পরিবারের মধ্যে ফিরে আসে চাপা গর্ব ও সামাজিক অহংকার—লঙ্গরখানায় গিয়ে খাবার নেওয়ার অনীহা তার স্পষ্ট উদাহরণ। অথচ এই সামান্য স্বস্তির আড়ালেই লুকিয়ে থাকে আরও ভয়াবহ সত্য।

'ভাসান' গল্পে নারী চরিত্র সংখ্যা কম হলেও তাদের মনস্তত্ত্ব অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে বিতুনের মা চরিত্রটির মাধ্যমে লেখক এক সাধারণ গ্রামীণ নারীর মমতা, ভয়, দায়িত্ববোধ ও মানসিক দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করেছেন। ভয়াবহ বন্যার পরিস্থিতিতে একজন মায়ের মানসিক অবস্থা কীভাবে পরিবর্তিত হয়, সেই দিকটি গল্পে গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

গল্পে বিতুনের মায়ের চরিত্রে প্রথমেই যে দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো মাতৃত্ববোধ। বন্যার ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তিনি সর্বপ্রথম নিজের সন্তানের নিরাপত্তার কথা ভাবেন। জল বাড়তে থাকলে তিনি সন্তানদের কাছে টেনে নেন এবং তাদের সাহস জোগানোর চেষ্টা করেন। এই আচরণ একজন মায়ের স্বাভাবিক স্নেহ ও দায়িত্ববোধের প্রকাশ।

প্রবল ঝড়, বৃষ্টি ও বন্যার মধ্যে ঘরবাড়ি ডুবে যাওয়ার আশঙ্কায় বিতুনের মা ভীত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কিন্তু সেই ভয় তিনি সরাসরি প্রকাশ করেন না; বরং সন্তানদের সামনে নিজেকে দৃঢ় রাখার চেষ্টা করেন। এই দ্বৈত মানসিকতা—অন্তরের ভয় ও বাহ্যিক দৃঢ়তা—নারী মনস্তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

গল্পে দেখা যায়, নদীর জলে যখন মৃতদেহ ভেসে আসে, তখন মা সেটিকে দুর্গাপ্রতিমার কাঠামো বলে বোঝাতে চান। এর মাধ্যমে তিনি সন্তানদের মানসিকভাবে রক্ষা করতে চান। এই প্রবণতা একজন মায়ের স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া—সন্তানের নিষ্পাপ মনকে কঠিন বাস্তবতা থেকে আড়াল করা। আবার বন্যার সময় অন্য মানুষের দুর্দশার কথাও মায়ের মনে আসে। যদিও তিনি সরাসরি সাহায্য করতে পারেন না, তবু তার কথাবার্তায় উদ্বেগ ও সহানুভূতির প্রকাশ পাওয়া যায়। এটি নারীর কোমল ও মানবিক মনোভাবের পরিচয়।

প্রকৃতির ভয়াবহতার সামনে বিতুনের মা নিজেকে অসহায় অনুভব করেন। সংসার, সন্তান ও জীবন সবকিছুই যখন বিপদের মুখে, তখন তার মনের গভীরে জন্ম নেয় অনিশ্চয়তা ও আতঙ্ক। এই অসহায়তার অনুভূতি গল্পের নারী মনস্তত্ত্বকে আরও বাস্তব করে তোলে।

'ভাসান' গল্পেও নারীর মনস্তত্ত্ব প্রধানত মাতৃত্ব, স্নেহ, ভয়, সহানুভূতি এবং সন্তানের প্রতি সুরক্ষাবোধের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। বিতুনের মায়ের চরিত্রের মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন—প্রকৃতির ভয়াবহতার মাঝেও একজন মা তার সন্তানের মানসিক ও শারীরিক নিরাপত্তা রক্ষায় সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। এই মানবিক ও সংবেদনশীল মানসিকতাই গল্পে নারী চরিত্রকে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে।

'ব্যভিচারিণী' গল্পে লেখক নারীচরিত্রকে সরাসরি সামাজিক ভাষ্যে নয়, বরং প্রতীকী ও মনস্তাত্ত্বিক স্তরে তুলে ধরেছেন। এখানে নারীর মনস্তত্ত্ব মূলত দুইটি চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে—গোলাপি এবং পদ্ম। একদিকে মানবী গোলাপি, অন্যদিকে সাপিনী পদ্ম। এই দুই নারীর আচরণ, আকর্ষণ, প্রেম ও বিচ্ছেদ—সব মিলিয়ে গল্পে নারীর মনস্তত্ত্বের জটিল ও গভীর রূপ ফুটে উঠেছে।

গোলাপির চরিত্রে নারীর অস্থিরতা ও আকর্ষণপ্রবণতা ধরা পড়ে। লখিন্দরের স্ত্রী হিসেবে সে প্রথমে স্বাভাবিক সংসারজীবন কাটালেও পরে নগারির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। নগারির শক্তি, ব্যক্তিত্ব ও রোমাঞ্চকর জীবনের প্রতি গোলাপির আকর্ষণ জন্মায়। এই আকর্ষণই তাকে স্বামীর সংসার ছেড়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে চলে যেতে প্ররোচিত করে। এখানে নারীর মনস্তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক দেখা যায়—নারী শুধু স্থির সংসারেই আবদ্ধ থাকে না, তার মন নতুনত্ব, শক্তি ও আকর্ষণের দিকেও ঝুঁকে পড়তে পারে। গোলাপির এই আচরণ সামাজিক দৃষ্টিতে 'ব্যভিচার' হলেও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এটি তার স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা ও আবেগের প্রকাশ।

পদ্ম সাপিনী চরিত্রেও নারীর মনস্তত্ত্বের প্রতীকী প্রকাশ দেখা যায়। পদ্ম প্রথমে লখিন্দরের প্রতি গভীর সোহাগ ও ঘনিষ্ঠতা দেখায়। লখিন্দরও তাকে নিজের স্ত্রীর মতো ভালোবাসে। কিন্তু নতুন এক পদ্মগোখরো সাপ ঘরে আসার পর পদ্মের আচরণ বদলে যায়। সে ধীরে ধীরে সেই নতুন সাপের দিকে আকৃষ্ট হয়। শেষপর্যন্ত তাদের মিলনের দৃশ্য দেখে লখিন্দর ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। এই ঘটনার মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন যে প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী আকর্ষণ, কামনা ও প্রজননের প্রবৃত্তি খুবই স্বাভাবিক। পদ্মের এই আকর্ষণ মানব সমাজের নৈতিকতার মধ্যে পড়ে না; বরং এটি প্রকৃতির সহজ নিয়ম।

এই দুই নারীচরিত্রের মাধ্যমে গল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশিত হয়—পুরুষের দৃষ্টিতে নারীকে প্রায়শই "বিশ্বাসঘাতক" বা "ব্যভিচারিণী" মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে নারীর আচরণ অনেক সময় তার স্বাভাবিক আবেগ, আকর্ষণ বা স্বাধীনতার প্রকাশ। গোলাপি যেমন নগারির সঙ্গে চলে যায়, তেমনি পদ্মও তার স্বজাতির সাপের প্রতি আকৃষ্ট হয়। লখিন্দর এই ঘটনাগুলিকে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে দেখে, কারণ তার মধ্যে গোলাপির চলে যাওয়ার ক্ষত এখনও জীবন্ত।

'ব্যভিচারিণী' গল্পে নারী মনস্তত্ত্বকে লেখক অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপন করেছেন। এখানে নারীকে একমাত্রিক বা নৈতিকতার খাঁচায় বন্দি করে রাখা হয়নি; বরং তার আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতা, স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং

পরিবর্তনশীল মনকে তুলে ধরা হয়েছে। ফলে গল্পটি শুধু বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনি নয়, বরং নারী মনের জটিলতা ও স্বাভাবিকতার গভীর বিশ্লেষণও হয়ে উঠেছে।

আধুনিক নগরজীবনের দাম্পত্য সম্পর্ক, একাকিত্ব এবং মানসিক শূন্যতার গভীর বিশ্লেষণ পাওয়া যায় 'কুকুর' গল্পে। গল্পটির কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র পল্লবী। তার চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক আধুনিক শিক্ষিতা নারীর মানসিক জটিলতা, আবেগ, নিরাপত্তাবোধ এবং ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষাকে সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। পল্লবীর আচরণ, চিন্তা ও সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ করলে নারীমনের নানা স্তর স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পল্লবীর চরিত্রের প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো স্বামীর প্রতি গভীর সান্নিধ্যবোধ। সদ্যবিবাহিত জীবনে সে স্বামীর কাছ থেকে সময়, সঙ্গ ও ভালোবাসা আশা করে। কিন্তু অলীক যখন কর্মসূত্রে দীর্ঘ ছ'মাস বিদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন পল্লবী তা সহজে মেনে নিতে পারে না। এখানে নারীমনের একটি স্বাভাবিক দিক প্রকাশ পায়— নারী দাম্পত্য জীবনে আবেগ ও মানসিক সম্পর্ককে বেশি গুরুত্ব দেয়। পল্লবীর কাছে সংসার মানে কেবল দায়িত্ব নয়, বরং পারস্পরিক উপস্থিতি ও ভালোবাসার অনুভূতি। স্বামীর অনুপস্থিতি তার কাছে মানসিক শূন্যতা তৈরি করে।

অলীক বিদেশে যাওয়ার পর পল্লবী সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়ে। নতুন ফ্ল্যাট, নতুন পরিবেশ—সব মিলিয়ে সে গভীর নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।

এই পরিস্থিতিতে অলীক একটি অ্যালসেশিয়ান কুকুর এনে দেয়, যাতে পল্লবী নিরাপদ বোধ করে। প্রথমে পল্লবী কুকুরটিকে গ্রহণ করতে না পারলেও ধীরে ধীরে সেটিই তার একমাত্র সঙ্গী হয়ে ওঠে। এখানে নারীমনের আরেকটি দিক প্রকাশিত হয়— একাকিত্ব মানুষকে মানসিকভাবে দুর্বল করে এবং তখন সে বিকল্প আশ্রয় খুঁজে নেয়।

পল্লবী ধীরে ধীরে কুকুর ববির প্রতি অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। সে ববির সঙ্গে কথা বলে, তাকে নিজের জীবনের অংশ করে নেয়, এমনকি তার প্রতি মানুষের মতো আচরণ করে। এই আচরণ নারীমনের আবেগপ্রবণতার দিকটি তুলে ধরে। পল্লবী আসলে তার স্বামীর অনুপস্থিতির শূন্যতা পূরণ করার জন্য ববিকে মানসিক আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করে। তার এই নির্ভরশীলতা ক্রমে অস্বাভাবিক পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

গল্পের শেষে দেখা যায়, পল্লবী ববির সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে স্বামী অলীক তার নিজের ঘরেই যেন অচেনা হয়ে যায়। ববি অলীককে বেডরুমে ঢুকতে দেয় না, আর পল্লবীও এই পরিস্থিতিকে বাধা দেয় না। এখানে নারীমনের একটি জটিল দিক ফুটে ওঠে— যার সঙ্গে সে মানসিকভাবে জড়িয়ে পড়ে, তার প্রতি গভীর অধিকারবোধ তৈরি হয়। ফলে পূর্বের সম্পর্কও পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।

পল্লবীর আচরণ শেষ পর্যন্ত এক ধরনের মানসিক বিকৃতির দিকে ইঙ্গিত করে। একাকিত্ব, অবহেলা এবং দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ তাকে এমন অবস্থায় নিয়ে যায় যেখানে বাস্তব ও অস্বাভাবিকের সীমারেখা মুছে যায়। লেখক এই চরিত্রের মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন—
মানুষের স্বাভাবিক আবেগ ও প্রয়োজনকে অবহেলা করলে তা বিকৃত রূপ নিতে পারে।

'কুকুর' গল্পে পল্লবী চরিত্রটি নারীমনের সূক্ষ্ম ও জটিল রূপকে প্রকাশ করেছে। তার মধ্যে ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা, একাকিত্বের ভয়, আবেগপ্রবণতা, নির্ভরশীলতা এবং অধিকারবোধ—সবই রয়েছে। গল্পটি শেষ পর্যন্ত আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে দাম্পত্য জীবনে মানসিক সান্নিধ্য ও পারস্পরিক বোঝাপড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর অভাব হলে মানুষের মনস্তত্ত্বে গভীর পরিবর্তন ঘটে এবং সম্পর্কের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে গ্রামীণ দরিদ্র নারীর জীবনসংগ্রামও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 'লাশকাটা ঘর' গল্পে পিথা চরিত্রটি তার একটি শক্তিশালী উদাহরণ। 'লাশকাটা ঘর' গল্পটি মূলত এক মফঃস্বল হাসপাতালের মর্গকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। গল্পে যেমন সমাজের অন্ধকার, দারিদ্র্য ও নৈতিক অবক্ষয় ফুটে উঠেছে, তেমনি নারীর মনোজগতের জটিলতা ও সংকটও অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষ করে পিথা চরিত্রের মাধ্যমে লেখক নারীর আবেগ, অসহায়তা, বেঁচে থাকার সংগ্রাম এবং মানসিক দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছেন। তাই গল্পটির নারী মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নারী চরিত্রের ভেতরে ভালোবাসা, নিরাপত্তাহীনতা, স্বার্থরক্ষা এবং সামাজিক চাপ—সবকিছু মিলিয়ে এক জটিল মানসিক অবস্থা কাজ করে।

পিথার ভালোবাসা ও আবেগের দিক লক্ষ্য করা যায়। গল্পের শুরুতে পিথা ও বদুর সম্পর্কের মধ্যে একধরনের আন্তরিকতা ও আকর্ষণ ছিল। নদীর ধারে গাঁজার নেশায় মেতে ওঠা সেই দুপুরের স্মৃতিতে তাদের সম্পর্কের মধ্যে সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত ঘনিষ্ঠতা দেখা যায়। পিথা বদুর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করে, মজা করে, এমনকি কখনো মনের টানও প্রকাশ করে। এই অংশে পিথার মানসিকতা একেবারেই সরল ও স্বাভাবিক এক গ্রামীণ মেয়ের মতো। সে আবেগপ্রবণ, মুহূর্তের আনন্দে ভেসে যেতে পারে এবং পুরুষের সান্নিধ্যে নিজেকে মুক্ত করে দিতে দ্বিধা করে না।

পিথার নিরাপত্তাহীনতা ও বেঁচে থাকার সংগ্রাম নারী মনস্তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ দিক। পিথা দরিদ্র পরিবারের মেয়ে এবং সমাজে তার কোনো শক্ত ভিত্তি নেই। ফলে জীবনে টিকে থাকার জন্য তাকে শক্তিশালী পুরুষের আশ্রয় নিতে হয়। কম্পাউন্ডারবাবুর কাছে কাজ পাওয়ার পর সে ধীরে ধীরে বদুকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে। এখানে পিথার আচরণ শুধু স্বার্থপরতা নয়; বরং সামাজিক বাস্তবতার কারণে তার মানসিক পরিবর্তন। একজন দরিদ্র নারী নিজের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে যে কোনো সুযোগকে আঁকড়ে ধরতে চায়—এটাই তার মানসিকতার বাস্তব রূপ।

পিথার দ্বৈত মানসিকতা গল্পে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একদিকে সে বদুর কাছে ভালোবাসার ইঙ্গিত দেয়, আবার অন্যদিকে কম্পাউন্ডারের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে। এই দ্বৈত আচরণের মধ্যে নারীর অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায়। সে হয়তো সত্যিই বদুকে ভালোবাসে, কিন্তু বাস্তবতার কঠিন চাপ তাকে অন্য পথে ঠেলে দেয়। ফলে তার আচরণে কখনো প্রেম, কখনো দূরত্ব, কখনো কৌশল—সবকিছু মিলেমিশে যায়। এই দ্বিধাগ্রস্ত মানসিক অবস্থাই নারী মনস্তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

নারীর সামাজিক অপমানবোধ ও আত্মরক্ষার প্রবণতাও গল্পে ফুটে উঠেছে। যখন বদু তাকে ডোমনী বলে অপমান করে, তখন পিথা রাগ ও অপমানে প্রতিক্রিয়া দেখায়। এতে বোঝা যায়, সমাজে নিচু জাত বা দরিদ্র পরিবারের মেয়ে হলেও তার আত্মসম্মানবোধ রয়েছে। সে নিজেকে ছোট করে দেখতে চায় না এবং নিজের মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা করে। এই মনোভাব নারীর আত্মপরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

গল্পে মৃত নারীদেহের উপস্থিতিও নারী জীবনের এক করুণ বাস্তবতার প্রতীক। লাশঘরে আসা সেই নারী-লাশ, যার শরীরে গর্ভধারণের চিহ্ন রয়েছে, সমাজের নিষ্ঠুরতা ও নারীর অসহায়তার ইঙ্গিত দেয়। সেই নারী হয়তো সামাজিক লজ্জা, প্রতারণা বা নির্যাতনের কারণে আত্মহত্যা করেছে। এখানে নারী মনস্তত্ত্বের আরেকটি দিক প্রকাশ পায়—সমাজের চাপে ভেঙে পড়া এবং চরম হতাশায় আত্মবিনাশের পথ বেছে নেওয়া।

সবশেষে বলা যায়, 'লাশকাটা ঘর' গল্পে নারী চরিত্রের মাধ্যমে লেখক মানুষের মনোজগতের গভীর দিক তুলে ধরেছেন। পিথার মধ্যে যেমন প্রেম ও কোমলতা আছে, তেমনি আছে বেঁচে থাকার তাগিদে কৌশল, দ্বিধা ও মানসিক টানাপোড়েন। অন্যদিকে মৃত নারীর দেহ সমাজের নির্মম বাস্তবতার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। ফলে গল্পে নারী মনস্তত্ত্ব শুধু ব্যক্তিগত আবেগ নয়, বরং সামাজিক চাপ, দারিদ্র্য এবং ক্ষমতার কাঠামোর সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

এই গল্পে নারী চরিত্র অত্যন্ত বাস্তবধর্মী ও জটিল রূপে চিত্রিত হয়েছে। পিথার চরিত্রে যেমন প্রেম, আকর্ষণ ও আত্মসম্মান রয়েছে, তেমনি সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ও বেঁচে থাকার সংগ্রামও রয়েছে। এই বহুমাত্রিক মানসিক অবস্থার মধ্য দিয়েই লেখক নারীর অন্তর্জগতের সত্যকে তুলে ধরেছেন।

'সমুদ্রের চোখ' গল্পে লেখক একজন নারী শিল্পীর অন্তর্জগৎ, তার দমন করা স্বপ্ন, যন্ত্রণা ও মানসিক দ্বন্দ্বকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্রীলেখা চ্যাটার্জি—এক প্রতিভাবান শিল্পী, যার শিল্পীসত্তা সমাজ ও পারিবারিক কাঠামোর চাপে ক্রমে দমিত হয়ে যায়। এই গল্পে নারীর মনস্তত্ত্ব মূলত তার সৃষ্টিশীলতা, স্বপ্নভঙ্গ, আত্মত্যাগ এবং অন্তর্গত বেদনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীলেখা চ্যাটার্জির চরিত্রে আমরা একজন সংবেদনশীল ও সৃষ্টিশীল নারীর মন দেখি। বিয়ের আগে তিনি সম্পূর্ণভাবে শিল্পচর্চায় নিমগ্ন ছিলেন। তার ছবি আঁকার মধ্যে ছিল স্বাধীনতা ও আনন্দ। কিন্তু বিয়ের পরে তিনি নিজের ইচ্ছা ও প্রতিভাকে ত্যাগ করে সংসারজীবনে নিজেকে উৎসর্গ করেন। এখানে নারীর মনস্তত্ত্বের একটি

গুরুত্বপূর্ণ দিক ফুটে ওঠে—নিজের স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে পরিবারকে প্রাধান্য দেওয়া। সমাজে অনেক নারীই নিজের ইচ্ছা ও প্রতিভাকে চাপা দিয়ে সংসারের দায়িত্বকে বড় করে দেখেন; শ্রীলেখাও তার ব্যতিক্রম নন।

গল্পে নারীর অন্তর্লুকানো বেদনা ও নিঃসঙ্গতা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীলেখার আঁকা ছবিগুলোতে প্রায় সবখানেই বিষণ্ণতা ও যন্ত্রণার ছাপ দেখা যায়। বিশেষ করে 'দি ইনার ভিসিয়ন' নামের ছবির চোখটি যেন তার নিজের মনের গভীর বেদনার প্রতীক। এই চোখ সমুদ্রের মতো গভীর এবং অশান্ত—যা নারীর অন্তর্দ্বন্দ্ব, দুঃখ ও অপূর্ণতার প্রতিফলন। বাহ্যিকভাবে সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন থাকলেও তার অন্তরে যে অস্থিরতা ও বেদনাবোধ ছিল, তা তার শিল্পকর্মে প্রকাশ পেয়েছে।

শ্রীলেখার জীবনে স্বপ্নভঙ্গ ও আত্মপরিচয়ের সংকট নারী মনস্তত্ত্বের আরেকটি দিককে তুলে ধরে। তিনি স্বপ্ন দেখতেন নতুন নতুন জায়গায় ঘুরে ল্যান্ডস্কেপ আঁকার। কিন্তু সেই স্বপ্ন পূর্ণ হয়নি। ফলে তার মনে তৈরি হয় এক ধরনের শূন্যতা ও হতাশা। গল্পে যে সুড়ঙ্গের ছবির কথা বলা হয়েছে, সেখানে একটি তরুণী অন্ধকারের দিকে দৌড়ে চলেছে—এটি আসলে শ্রীলেখার নিজের জীবনযাত্রার প্রতীক। আলো খুঁজে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকলেও শেষ পর্যন্ত সেই আলো অধরা থেকে যায়।

গল্পে নারীর অভিমান ও দমিত প্রতিবাদও প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীলেখা প্রথমে নিজের জীবনের ব্যক্তিগত বিষয় বলতে চান না। কিন্তু কথোপকথনের এক পর্যায়ে তিনি ইঙ্গিত দেন যে প্রকৃত শিল্পী কখনও নিজের প্রতিভা ইচ্ছায় লুকিয়ে রাখে না; তাকে বাধ্য করা হয়। এই কথার মাধ্যমে বোঝা যায়, সমাজ বা পারিবারিক চাপই তার শিল্পীসত্তাকে দমন করেছিল। এই দমিত প্রতিবাদ নারীর মানসিক যন্ত্রণা ও ক্ষোভেরই প্রকাশ।

'সমুদ্রের চোখ' গল্পে শ্রীলেখা চ্যাটার্জির চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারীর গভীর মনস্তত্ত্ব অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে ফুটে উঠেছে। তার শিল্পকর্ম, তার স্বপ্ন, তার বেদনা এবং তার দমিত প্রতিবাদ—সবকিছু মিলিয়ে এই গল্পটি নারীর মানসিক জগতের এক মর্মস্পর্শী প্রতিচ্ছবি। শ্রীলেখার আঁকা সেই চোখ আসলে একজন নারীর অন্তর্গত যন্ত্রণার প্রতীক, যা সমুদ্রের মতো গভীর ও অসীম।

'নিসর্গের চোখ' গল্পে পাপিয়া চরিত্রটি নারীর মানসিক আঘাতের গভীর অভিজ্ঞতা তুলে ধরে। প্রেমে প্রতারিত হওয়ার পর সে সমাজের কটূক্তি ও অপমানের মুখোমুখি হয়।

এই ঘটনার ফলে তার মনে জন্ম নেয় আত্মগ্লানি ও লজ্জা। যদিও প্রকৃত অপরাধী পুরুষটি, তবু সমাজের দৃষ্টিতে দোষী হয়ে ওঠে নারী। এই গল্পটি দেখায়—সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ অনেক সময় নারীর উপর একতরফা চাপ সৃষ্টি করে, যার ফলে তার মানসিক ভারসাম্য ভেঙে পড়তে পারে।

গল্পের শুরুতে দেখা যায়, পাপিয়া এক গভীর মানসিক আঘাত নিয়ে বাবার সঙ্গে শিউপুরে এসেছে। সমাজের কটূক্তি ও অপমান থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে তার বাবা তাকে এখানে নিয়ে আসে। পাপিয়ার মন তখন

ভীষণভাবে আহত ও ভেঙে পড়া। সে মনে করে যেন পুরো পৃথিবী তাকে ঘৃণার চোখে দেখছে। তার এই অনুভূতি নারীর আত্মসম্মানবোধ ও সামাজিক লজ্জার গভীর মানসিক প্রতিক্রিয়ার পরিচয় দেয়।

পাপিয়ার জীবনে স্পর্শদার প্রবেশ ছিল প্রেম ও আকর্ষণের মাধ্যমে। উনিশ বছরের এক তরুণী হিসেবে সে স্বাভাবিকভাবেই একজন সুদর্শন ও প্রভাবশালী ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়। স্পর্শদার প্রশ্রয়, আলাদা গুরুত্ব এবং স্নেহের ভান পাপিয়ার মনে প্রেমের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। এই ঘটনাগুলি নারীর সহজ-সরল বিশ্বাস ও আবেগপ্রবণতার মনস্তত্ত্বকে তুলে ধরে। পাপিয়া প্রেমকে সত্য ও পবিত্র বলে বিশ্বাস করেছিল, কিন্তু সেই বিশ্বাসই শেষ পর্যন্ত তার জন্য বিপর্যয় ডেকে আনে।

স্পর্শদার প্রতারণা ও শারীরিক সম্পর্কের পর পাপিয়ার জীবনে গভীর সংকট নেমে আসে। সে নিজের শরীরকে 'অশুচি' ও 'নষ্ট' বলে মনে করতে থাকে। এই আত্মগ্লানি ও অপরাধবোধ নারীর মানসিক জগতে সমাজের চাপ ও মূল্যবোধের প্রভাবকে স্পষ্ট করে। যদিও প্রকৃত অপরাধী স্পর্শদা, তবু সমাজের দৃষ্টিতে দোষী হয়ে ওঠে পাপিয়াই। ফলে তার মনে জন্ম নেয় হতাশা, লজ্জা এবং আত্মঘৃণা।

গল্পে আরও দেখা যায়, এই মানসিক আঘাত পাপিয়ার আচরণেও পরিবর্তন এনে দেয়। সে মানুষের প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে ওঠে এবং পুরুষদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করে। কখনও সে বিড়বিড় করে কথা বলে, কখনও আবার একা-একা প্রকৃতির মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। এর মাধ্যমে তার মানসিক অস্থিরতা, হতাশা এবং একাকীত্বের গভীর অনুভূতি প্রকাশ পায়।

এক্ষেত্রে প্রকৃতি পাপিয়ার মানসিক আশ্রয় হয়ে ওঠে। মানুষ যেখানে তাকে বিচার করেছে, সেখানে প্রকৃতি তাকে নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করেছে। শাল, সেগুন, মহুল বা শিরীষ গাছের সঙ্গে কথা বলে সে যেন নিজের দুঃখ ভাগ করে নিতে চায়। প্রকৃতির নীরব সান্নিধ্যে সে কিছুটা শান্তি খুঁজে পায়। এটি নারীর মনোজগতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক—আঘাত পেলে সে প্রকৃতি বা নির্জনতায় আশ্রয় খোঁজে।

'নিসর্গের চোখ' গল্পে পাপিয়ার চরিত্রের মাধ্যমে প্রেম, বিশ্বাস, প্রতারণা, লজ্জা, আত্মগ্লানি ও পুনরুদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা—এই সমস্ত অনুভূতির মধ্য দিয়ে নারীর জটিল মনস্তত্ত্বকে অত্যন্ত বাস্তব ও গভীরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

'লয়' গল্পে মৌ চরিত্রের মাধ্যমে এক শিক্ষিত, সংবেদনশীল ও সৃজনশীল তরুণীর মনোজগতকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তার কবিসত্তা, মানবিকতা, কৌতূহল, সামাজিক সচেতনতা এবং অচেনা এক আবেগের জন্ম—এসবের সমন্বয়ে এখানে নারীর মনস্তত্ত্ব গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

মৌ মূলত একজন কবিতাপ্রিয় তরুণী। প্রকৃতির দৃশ্য—গাছপালা, ফুল, আকাশ—এসবের মধ্যে সে নতুন শব্দ ও পঙক্তির সন্ধান করে। একটি সঠিক শব্দ না পেলে তার মনে অশান্তি সৃষ্টি হয়। এই প্রবল সংবেদনশীলতা

ও সৃষ্টিশীল মনই তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির সঙ্গে তার মানসিক সংযোগ তাকে এক কাব্যিক ভাবনায় আবিষ্ট করে রাখে।

মৌ শুধুই কবিতায় মগ্ন নয়; তার মধ্যে পারিবারিক দায়িত্ববোধও রয়েছে। বাবার মৃত্যুর পর বাড়ির দোতলার কাজ আবার শুরু করার উদ্যোগ সে নেয়। মায়ের অসুবিধার কথা ভেবে প্রতিদিন ছাদে গিয়ে মিস্ত্রিদের কাজ তদারকি করে। এতে বোঝা যায়, একজন নারীর মধ্যে যেমন সংবেদনশীলতা থাকে তেমনি বাস্তব দায়িত্ববোধও থাকে।

রাজমিস্ত্রী বিলয়দার জীবনকথা শুনে মৌ গভীরভাবে স্পর্শিত হয়। সে বুঝতে পারে, দারিদ্র্যের কারণে বিলয় পড়াশোনা শেখার সুযোগ পায়নি। তাই মৌ নিজের ইচ্ছায় তাকে বর্ণমালা শেখাতে শুরু করে। একজন শ্রমজীবী মানুষের শিক্ষার প্রতি এই আগ্রহ ও সহানুভূতি মৌয়ের মানবিক মনকে প্রকাশ করে।

মৌ শুধু বিলয়কে শেখায় না, বরং তার শেখার আগ্রহে নিজেও আনন্দ পায়। বিলয়ের শেখার অগ্রগতি তাকে বিস্মিত ও আনন্দিত করে। একজন নারী হিসেবে তার মধ্যে শিক্ষকসুলভ ধৈর্য, উৎসাহ ও উৎসর্গবোধ দেখা যায়। এটি তার ব্যক্তিত্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

বিলয়দার সঙ্গে কথাবার্তা ও যোগাযোগের মাধ্যমে মৌয়ের মনে এক অদ্ভুত আবেগের জন্ম হয়। বিলয় যখন চলে যাওয়ার কথা জানায়, তখন মৌয়ের মনে গভীর বিষাদ সৃষ্টি হয়। সে বুঝতে পারে না এই মনখারাপ কেবল অসমাপ্ত শিক্ষার জন্য, নাকি বিলয়ের প্রতি এক অজানা টানের কারণে। এই দ্বিধা ও অস্বস্তি নারী মনের সূক্ষ্ম আবেগকে প্রকাশ করে।

মৌ উপলব্ধি করে যে, কবিতা লেখা যেমন একটি শিল্প, তেমনি জীবনও একটি শিল্প। যেমন একটি কবিতায় ভুল শব্দ বসলে ছন্দপতন ঘটে, তেমনি জীবনের ধারায় হঠাৎ বিচ্যুতি ঘটলেও এক ধরনের মানসিক শূন্যতা তৈরি হয়। এই উপলব্ধি তার মানসিক পরিপক্কতার পরিচয় দেয়।

'লয়' গল্পে মৌ চরিত্রের মাধ্যমে সৃজনশীলতা, দায়িত্ববোধ, মানবিকতা, সহানুভূতি এবং অচেনা আবেগের টানাপোড়েন একজন সংবেদনশীল নারীর অন্তর্জগতকে উন্মোচিত করে। ফলে এই গল্পে নারী মন শুধু আবেগপ্রবণ নয়; বরং চিন্তাশীল, মানবিক এবং শিল্পসচেতন এক সত্তা হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে।

'ব্রহ্মার হাতে গড়া পুতুল' গল্পটি মূলত সুন্দরবনের মানুষের জীবনসংগ্রাম, প্রকৃতির সঙ্গে তাদের লড়াই এবং সামাজিক বাস্তবতার একটি দলিল। গল্পে নারীদের উপস্থিতি খুব বেশি প্রত্যক্ষভাবে না থাকলেও তাদের জীবনযন্ত্রণা, মানসিকতা ও সংগ্রামের ইঙ্গিত বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুন্দরবনের কঠিন জীবনযাত্রার মধ্যে নারীর মানসিক অবস্থা, সহনশীলতা, দায়িত্ববোধ এবং সংসার রক্ষার শক্তিই এখানে নারী মনস্তত্ত্বের প্রধান দিক।

সুন্দরবনে খরা, বন্যা, ঝড়—এই সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রায় প্রতি বছরই ঘটে। এসব দুর্যোগের সময় নারীদের ওপরই সংসার সামলানোর সবচেয়ে বেশি চাপ পড়ে। বন্যায় যখন মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়ে ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেয়, তখন নারীরাই সন্তানদের নিয়ে আশ্রয়স্থলে দিন কাটায়। খাদ্যের অভাব, বাসস্থানের অভাব এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যেও তারা ধৈর্য ধরে সংসার টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে।
এই ধৈর্য ও সহনশীলতা নারী মনের এক গভীর শক্তির পরিচয় দেয়।

গল্পে দেখা যায় বন্যার সময় অনেক মানুষ স্ত্রী-সন্তান নিয়ে আশ্রয় নেয় স্কুলবাড়ি বা উঁচু বাঁধে। এই পরিস্থিতিতে নারীর সবচেয়ে বড় চিন্তা থাকে সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখা। খাবারের সংকট, রোগব্যাধি এবং অনিশ্চয়তার মধ্যেও তারা সন্তানদের নিরাপত্তা ও যত্নের জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে। মাতৃত্ববোধ নারীর মানসিক জগতে এক গভীর মানবিক অনুভূতির প্রকাশ।

সুন্দরবনের পুরুষরা সাধারণত মাঠে কাজ করে বা জীবিকার জন্য বাইরে যায়, কিন্তু ঘরসংসার সামলানোর দায়িত্ব মূলত নারীদের উপরই পড়ে। দুর্যোগের সময় যখন ঘরবাড়ি ভেঙে যায় বা ফসল নষ্ট হয়, তখন নারীরাই আবার নতুন করে সংসার গুছিয়ে তোলার চেষ্টা করে। এই দায়বদ্ধতা নারীর বাস্তববাদী মানসিকতা এবং সংগ্রামী চরিত্রকে প্রকাশ করে।

গল্পে বারবার দেখা যায় প্রকৃতির আঘাতে সুন্দরবনের মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তবুও তারা হাল ছাড়ে না। এই সংগ্রামের ভিতরে নারীর মানসিক শক্তিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দুর্ভিক্ষ, বন্যা বা দারিদ্র্যের মধ্যেও নারীরা আশা ধরে রাখে—আগামী বছর হয়তো ভালো ফসল হবে, সংসার আবার গড়ে উঠবে। এই আশাবাদই তাদের মানসিক শক্তির মূল উৎস।

গল্পে নারীরা খুব বেশি কথোপকথনের মাধ্যমে সামনে আসেনি, কিন্তু তাদের উপস্থিতি রয়েছে নেপথ্যে। বন্যার সময় পরিবার নিয়ে আশ্রয় নেওয়া, ত্রাণশিবিরে দিন কাটানো, ঘরবাড়ি হারানোর কষ্ট সহ্য করা—এসব ঘটনার মধ্যে দিয়ে নারীরা নিঃশব্দ সংগ্রামের প্রতীক হয়ে ওঠে। তাদের এই নীরব সহিষ্ণুতা সুন্দরবনের সমাজজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক।

'ব্রহ্মার হাতে গড়া পুতুল' গল্পে নারীরা সরাসরি প্রধান চরিত্র না হলেও তাদের জীবনসংগ্রাম ও মানসিক শক্তি গভীরভাবে অনুভূত হয়। দুর্যোগের মধ্যে ধৈর্য, মাতৃত্ব, দায়িত্ববোধ এবং আশাবাদ—এই চারটি গুণ নারীর মনস্তত্ত্বকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

পরিশেষে বলি তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে নারী চরিত্রগুলি একমাত্রিক নয়; বরং তারা বহুমাত্রিক মানবিক সত্তা। কখনও তারা প্রেমিকা, কখনও মা, কখনও শিল্পী, কখনও সংগ্রামী গৃহবধূ। তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা ও আবেগের মধ্য দিয়ে লেখক নারীর মনস্তত্ত্বকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ভয়, ভালোবাসা, মাতৃত্ব, একাকিত্ব,

স্বপ্নভঙ্গ, দারিদ্র্য, সামাজিক অবহেলা, আত্মসম্মান এবং মানবিকতা—এই সব অনুভূতির সমন্বয়ে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নারী চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

এই কারণে তাঁর গল্পগুলি শুধু সামাজিক বাস্তবতার দলিল নয়; বরং মানুষের অন্তর্জগতেরও এক গভীর অনুসন্ধান। নারীর মনস্তত্ত্বের এই সূক্ষ্ম ও মানবিক চিত্রণ বাংলা ছো টোগল্পকে সমৃদ্ধ করেছে এবং পাঠকের মনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করেছে।

তথ্যসূত্র

১. বন্দোপাধ্যায়, তপন । 'সেরা পঞ্চাশটি গল্প'। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫
২. বন্দোপাধ্যায়, তপন । 'আমার একান্নটি গল্প'। একুশ শতক, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৯
৩. বন্দোপাধ্যায়, তপন । 'গল্পসমগ্র (প্রথম খন্ড)'। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২২
৪. বন্দোপাধ্যায়, তপন । 'গল্পসমগ্র (দ্বিতীয় খন্ড)'। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২৪